মোঃ আবদুল মুহিত

বিজ্ঞান শিক্ষার বেহাল দশা

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ কমে যাওয়া নিয়ে পত্রপত্রিকায় নানা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বিগত চার বছরে ছাত্রছাত্রীর বিজ্ঞান পড়ার হার মাধ্যমিকে ২২ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিকে ১৭ শতাংশ, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ১১ শতাংশ। এর অর্থ হল উচ্চ শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অন্যান্য শাখার তুলনায় অত্যন্ত কম। গত ১১ বছরে মাধ্যমিকে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমেছে ১১ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে কমেছে ৫ শতাংশ। যেখানে নকাইয়ের দশকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য, একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানভিত্তিক যুগে এসে তা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। অপরদিকে বেড়েছে বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর হার। নিঃসন্দেহে বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই ক্রমাবনতির হার এখন আশংকাজনক অবস্থায় এসে ঠেকেছে। এই দুষ্টচক্র থেকে এখনই উত্তরণ না ঘটলে জাতির কপালে ঘোর অমানিশার অন্ধকার অবধারিত। একটি জাতির সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং চর্চার উপরে। উন্নত বিশ্বে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপকতা এবং তদনুযায়ী গবেষণা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবে এখনও আমরা বিভিন্নভাবে উন্নত বিশ্বের মুখাপেক্ষী। এমতাবস্থায় আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ নিম্নমুখী। বড়ই হতাশাব্যঞ্জক খবর হল, সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনার অভাব এই সমস্যাকে প্রকট আকার ধারণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণত একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই শিশুদের বিজ্ঞানে হাতেখড়ি হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের চিরন্তন শাশ্বত ব্যবহারিক বিদ্যা তথা পরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের অনুপস্থিতিই শিশুদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার মূল কারণ। সম্মানিত শিক্ষক মহোদয় বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে ব্যবহারিক কিংবা হাতে-কলমে না দেখানোর ফলে ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থনির্ভর শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা তথ্য বা জ্ঞানকে মুখস্থ করার নামান্তর নয়। বিজ্ঞান শিক্ষায় দরকার পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত শিক্ষা উপকরণ। যা দিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা যায়। আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ মোটেও বিজ্ঞান উপযোগী নয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ে পানির তিন অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা রয়েছে। যেখানে বরফ, পানি ও বাষ্পের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের গ্রামগঞ্জের বিদ্যালয়গুলোর কয়জন শিক্ষার্থী এই বরফ জিনিসটি বুঝতে সক্ষম? প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র ঘরের শিক্ষার্থীর পক্ষে বরফ না দেখাটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষককে ওইদিন বরফের পানি এবং বাষ্পে পরিবর্তনটি শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য করা নিতান্তই কঠিন কাজ হবে। মাধ্যমিকের সিলেবাসে বর্ণিত, অম্ল ক্ষারকের লিটমাস পরীক্ষাটিও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের শুধু মুখস্থই করতে হয়। ফলে শিশু বয়সেই পরীক্ষণের অভাবে বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা তৈরি হয়ে যায় মনের অজান্তেই। আমার শিক্ষাজীবনে কখনও মনে পড়ে না কোনো শিক্ষক বাতাসে অক্সিজেনের উপস্থিতি নির্ণয়ের মোমবাতি পরীক্ষা ক্লাসে দেখিয়েছেন। এমনকি আজও কোনো শিক্ষক এসব পরীক্ষা ক্লাস চলাকালীন সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে উপস্থাপন করেন না। গ্রামাঞ্চলে কিংবা মফস্বল শহরের স্কুলগুলোতে ব্যবহারিক বিষয় শিখন এবং পঠনের কোনো বিজ্ঞানাগারই নেই। শহরের স্কুলগুলোতেও কয়টিতে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে জীবন্ত কোষ দেখার জন্য? ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, তাদের কাছ থেকে বিজ্ঞানাগার ফি নেয়া হলেও কোনো বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম বা রাসায়নিক উপাদান ক্রয় করা হয় না। সুতরাং পদার্থ কিংবা রসায়নের সহজ ব্যবহারিকগুলো হাতে-কলমে দেখানো হয় না। ফলে নবম-দশম কিংবা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ব্যবহারিকের কোনো ক্লাস হয় না বললেই চলে। এসব ক্ষেত্রে ওই পাঠ্যসূচি মুখস্থনির্ভর হয়ে পড়ে। যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত ভীতিকর বলেই দৃশ্যমান হয়। ভেবে দেখুন তেলাপোকার পৌষ্টিকতন্ত্র কিংবা ব্যাঙের অসব্যবচ্ছেদ বিষয়গুলো স্বীয় চোখে না দেখার অভাবে কত ছাত্রছাত্রীকে তা মুখস্থ করতে হচ্ছে। ফলে বিজ্ঞানের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ আসার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। উপরন্তু উপরের শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভীতিকর এসব তথ্যের কারণে নতুন নতুন শিক্ষার্থী আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব কারণে বিজ্ঞানের তুলনায় অন্যান্য শাখায় বেশি ছাত্রছাত্রীর ভর্তি প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

> উন্নত বিশ্বের মতো স্কুল-কলেজে ছোট ছোট শিশুদের কাছে বিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগানো যেতে পারে। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞান ও গণিত অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীসহ পিতামাতার মনে বিজ্ঞানের ভয় এবং শঙ্কা দূর করতে হবে।

আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও বিজ্ঞান শিক্ষার অনুপযোগী। সাধারণত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে স্কুলের বাইরেও তাদের আলাদাভাবে সেই বিষয়ে প্রাইভেট টিউটর রাখা কিংবা কোচিংয়ে পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের পেছনে শিক্ষা বাবদ বেশি ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে অনেক পিতামাতা ভেবে থাকেন অযথাই বিজ্ঞান পড়ে এত কষ্ট করার চেয়ে অন্যান্য শাখায় খুব সহজেই এ প্লাস পাওয়া যেতে পারে। তাই তাদের আর্থিক সক্ষমতা কিংবা সন্তানের পরিশ্রম করার মনমানসিকতার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যারা মনে করেন বিজ্ঞান শুধু ভালো ফলাফলধারী ছাত্রছাত্রীই পড়ার যোগ্যতা রাখে। ব্যক্তিগতভাবে অনেক ছাত্রছাত্রীকে দেখেছি, যাদের আগ্রহ ছিল বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে কিন্তু স্কুলের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে তাদের অন্য শাখায় পড়তে হয়েছে। তাই বিশেষ করে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখজনক হারে কমতে শুরু করে। এটি একটি বিরাট ভুল। কারণ কে কোন বিষয়ে ভবিষ্যতে দক্ষ হবে তা অন্য কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয় না। একদিক থেকে পরিবারের অনিচ্ছা, অন্যদিকে শিক্ষকদের অবহেলা— দুইয়ে মিলে যে কোনো ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, অনেক স্কুলে কিংবা কলেজে বিজ্ঞানের বিষয় পঠন-পাঠনে অতিব্যয়ের কারণে ওই শাখা খুলতে এক ধরনের অনীহা বিরাজ করছে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত ব্যয়ের অনাগ্রহ, স্থান সংকট, সর্বোপরি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই এর মূল কারণ। বিষয়টির আরম্ভ হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেলেই দেখা যায়, বাণিজ্য বিষয়ে প্রথম সম্মান কোর্স চালু হয়। সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য কোনো কোর্স থাকুক আর না থাকুক, বাণিজ্য অনুষদ অবশ্যই আছে। কারণ বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য ধারার কোর্সগুলোতে বিনিয়োগের তুলনায় মুনাফা অত্যন্ত বেশি। স্বল্প স্থানেই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর পড়াশোনা সম্ভব হয়ে থাকে। হয়তো কালেভদ্রে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়ানো হয়ে থাকে, সেটা সীমিত প্রায়োগিক বিষয়গুলোর মধ্যে। আবার সে ক্ষেত্রে দেখা যায়, পড়াশোনা শেষ করা পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে একজন ছাত্রের পেছনে পিতামাতার অধিক অর্থ ব্যয় হয়। বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান কোর্স পড়ানো হয় বলে জানা নেই। অপরপক্ষে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের মোট ছাত্রছাত্রীর আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে পর্যাপ্ত গবেষণাগার, ব্যবহারিক শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষা উপকরণ, স্থান সংকুলানের প্রয়োজন হয়।

উন্নত বিশ্বের মতো স্কুল-কলেজে ছোট ছোট শিশুদের কাছে বিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগানো যেতে পারে। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞান ও গণিত অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীসহ পিতামাতার মনে বিজ্ঞানের ভয় এবং শঙ্কা দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। মাধ্যমিক পর্যায়ে শুরু থেকেই কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যসূচি থাকা আবশ্যক। এতে করে বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ তৈরি হবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামোর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা উচিত। নতুন নতুন প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সবার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সর্বোপরি সমাজের প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা এবং এর সফলতা তুলে ধরতে হবে। বিজ্ঞানমনস্ক একটি জাতিই পারে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলা উপহার দিতে।

মোঃ আবদুল মুহিত : *সহকারী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগ, ঢাবি এবং পিএইচডি গবেষক, জাপান*
muhit@du.ac.bd

সমকাল
তারিখ: 03 MAY 2014
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ৬